সেন্নুসিদের দেশে

সাহারা মরুভূমির মধ্যে সেন্নুসি বলে একটি অজ্ঞাত জাতি বাস করে। এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম নয়। কিন্তু এদের দেশে খুব কম সভ্য মানুষেরই যাতায়াত সম্ভবপর হয়। মিঃ কোভিন্টন বিখ্যাত মার্কিন মিশরীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ভ্রমণকারী।ইনি বহু বিপদ অগ্রাহ্য করে যে রহস্যময় মরুদ্বীপে সেন্নুসিদের বাসভূমি, সেখানে গিয়েছিলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা যে ফিরেও এসেছিলেন।আমরা তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করলাম :—

আমি যখন সিউয়াতে ছিলাম, তখন সেখানে সেন্নুসিদের সর্দ্দার ওসমান হাবুনের সঙ্গে দেখা করি।

ওসমান হাবুনের বাড়ীর চারিধারে সুন্দর বাগান। আমরা যখন সেখানে গোধূলির সময় বসে আছি, তখন খেজুরবাগানে পূর্ণচন্দ্র উঠলো এবং আমি লক্ষ্য করলাম চাঁদের উপরের প্রান্ত সর্দ্দার সাহেবদের বাঁ চোখের ওপরের ভুরুর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়েছে।

হেসে বল্লাম—আপনার সৌভাগ্যের দিন আসচে, এ তারই চিহ্ন।

তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, কিছু বল্লেন না। তিনি যে অপদেবতাকে ভয় করেন, তাঁর বাড়ীর সামনে টাঙানো জীবজন্তুর মাথার হাড় দেখে তা বুঝতে দেরী হয় না। সেন্নুসিদের মধ্যে এই ভয় এত বেশী যে তাদের জাতির মধ্যে যদি কেউ যাদুকর বা ডাইনি বলে ধরা পড়ে, তবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।ডাইনিতে কাউকে গুণ করেচে জানা গেলে ভূতের ওঝাকে আহ্বান করা হয়। ওঝা এসে একটা ডিমের ওপর নানারকম আঁকজোক এঁকে মাথার ওপর সেটা সাত বার ঘোরায়, তারপর সেই ডিমটা সকলের সামনে ভাঙা হয়। এর ফলে ডাইনির প্রভাব চলে যায় বলে লোকের বিশ্বাস। মরুভূমির সর্ব্বত্রই তাদের মতে জীন পরীদের বাস। এদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ছেলেবুড়ো সবাই গলায় মন্ত্রপূত কবচ ধারণ করে। সমাধিভূমি তো এদের আড্ডা।

এ সম্বন্ধে আরও নানাপ্রকার বিশ্বাস এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। মরুভূমির মধ্যে একটা কূপ আছে, বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে কন্যাকে এই কূপের জলে স্নান করতে হয়—যখন সে স্নান করতে যাবে তখন যদি কোনো লোক তার চোখে পড়ে যায়, তবে সে লোকটির সর্ব্বনাশ। তাকে ঠিক সেই রাত্রেই ভূতে ধরবে। এ জাতির প্রথানুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবা স্ত্রীলোকটিকে একটা অন্ধকার ঘরে চারমাস আবদ্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। চারমাস ধরে পূর্ব্বোক্ত কূপের জলে স্নান করার পরে সে শুদ্ধ হয়ে পুনরায় লোকসমাজে মিশবার অধিকার পায়।

বাগান থেকে উঠে আমি সেন্নুসি সর্দ্দারের বাড়ী গেলাম। একটি ছোট পাহাড়ের ওপর নোনামাটির আটতলা বাড়ী, চারিধার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মাটির তলায় পথ, সেখান দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হয়। আমরা প্রথম পাঁচতলা উঠলাম, প্রত্যেক ঘরে ছোট ছোট তেকোণা জানালা। ঘরগুলি প্রাচ্যপ্রথায় সুন্দররূপে সাজানো। দেওয়ালে অনেকগুলো গজাল পোঁতা, তাতে পুরোনো আল্‌জিরীয় গাদা-বন্দুক টাঙানো রয়েচে।

ভাল বন্দুক যে ছিল না তা নয়। সেগুলো অনেক সময় মাটির মধ্যে লুকোনো থাকে।

আমরা চা-পান করতে করতে নানাবিষয়ে গল্প করছিলাম—কেবল যেটা আমার প্রধান বক্তব্য, সেটাই বল্লাম সকলের শেষে।

—সর্দ্দার সাহেব, আমি জারাবুব যেতে পারি?

সর্দ্দার স্বল্পভাষী লোক, ঘাড় নেড়ে মাত্র একটী কথা বল্লে—না।

জানতাম এখানে আর কোনো কথা উত্থাপন করে লাভ নেই। এখানে আমার আশা ভরসা ফুরিয়েচে।

সর্দ্দার সাহেবের আশা—ভরসাও ফুরিয়েছিল, ছ'মাসে পরে গবর্মেন্টের আদেশে কোনো একটা বিষয়ে গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে।

সিউয়ায় অবস্থানকালে আমি ওয়েসিসের নানাস্থানে ঘুরে দেখে বেড়িয়েছিলাম।দক্ষিণে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে, প্রাণ হাতে নিয়ে সেখানে যেতে হয়। কারণ সাপ, বিছা ও বিষাক্ত ট্যারান্টুলা মাকড়সায় তার প্রত্যেকটী ফাটল ভর্ত্তি।

একদিন আমি ইজিপ্সিয়ান গবর্মেন্টের ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করলাম। ভদ্রলোকের নাম ডাঃ সেরিফ্।তিনি আমায় বল্লেন জারাবুক ও সিউয়ার মধ্যে একটী অদ্ভুত লবণ হ্রদ আছে, সেটা দেখা খুব দরকার।

আমরা ডাক্তারের বাগানে বসে কথা বলছিলাম।হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডাক্তারের সেন্নুসি চাকর বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা কান পেতে শুনচে দেখে আমরা তাকে অন্য কাজে দূরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি স্থির করলাম আরাশির এই লবণহ্রদ দেখতে হবেই। রাত্রে চুপিচুপি যদি না যাই, তবে স্থানীয় লোকে বাধা দিতে পারে, কারণ সেন্নুসিরা চায় না যে তাদের দেশের এই সব গুপ্তস্থানে বৈদেশিক ও বিধর্মী লোকে যাতায়াত করে।

সমস্ত আয়োজন ঠিক করে আমি সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে একা বেড়াতে বার হোলাম। খর্জ্জুর-কুঞ্জের দিকে মাত্র দশ গজ আন্দাজ এগিয়েছি এমন সময় দুজন শ্বেতপরিচ্ছদ-পরিহিত সশস্ত্র সেন্নুসি গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে কিছুক্ষণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে তখনি আবার অন্তর্হিত হোল।

এরা আমায় কি ইঙ্গিত করলে? হয়তো আমি লুকিয়ে হ্রদের দিকে গেলে ওরা আমায় জোর করে বাধা দেবে। হয়তো হত্যা করবে।

কিংবা আমার ভুল হতেও পারে। ওদের মনে ওসব হয়তো নেই।

অন্ধকারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করলাম কিছু দেখা যায় কিনা। দশ মিনিট কেটে গেল। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।আমি কিছুদূর অগ্রসর হয়েচি, আবার সেই দুজন অস্ত্রধারী সেন্নুসিকে দেখা গেল।

লবণ হ্রদ দেখবার আশা অন্ততঃ সেরাত্রে আমায় ছাড়তে হোল।ওরা যে ভয় দেখিয়েচে, তা কাজে পরিণত করতে ওদের বেশী সময় লাগবে না। স্বেচ্ছায় প্রাণ বিপন্ন করার মত মূর্খতা আর কি আছে?

সেদিন থেকে যতদিন আমি সিউয়াতে ছিলাম—সব সময় সেন্নুসি গুপ্তচরেরা আমার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছিল। যেখানেই আমি কেন বেড়াতে বার হই, দুজন সশস্ত্র সেন্নুসি চর দূর থেকে সব সময়ই আমায় অনুসরণ করে।

বিরক্ত হয়ে ২১শে আগষ্ট সিউয়া ছেড়ে অন্যত্র রওনা হবার আয়োজন করলাম। মধ্য যুগে আরাশির লবণ হ্রদ থেকে উৎপন্ন লবণ ইউরোপে পর্য্যন্ত রপ্তানী হোত—পূর্ব্বে পারস্য দেশে পর্য্যন্ত। সিউয়া ওয়েসিসের জলপাইয়ের তেল খুব প্রসিদ্ধ, কিন্তু তা খুব কম পরিমাণেই উৎপন্ন হয় বলে বাইরে রপ্তানী করার সুবিধে হয় না।

সিউয়া থেকে রওনা হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আয়েণ শাকার ঝরণায় পৌঁছলাম। স্বাস্থ্যপ্রদ জলের জন্যে এই ঝরণা বিখ্যাত। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ঝরণার নাম চারিদিকে ছড়িয়েচে।ঝরণাটি আবির্ভূত হয়েচে বেশীদিন নয়।

এর আবিষ্কার হয় অদ্ভুত রকমে।

একজন সেন্নুসি পথিকপথ দিয়ে যেতে যেতে একটা খর্জ্জুর-কুঞ্জের মধ্যে বন্দুকেরআওয়াজের মত একটা আওয়াজ শুনতে পেলে। তার মধ্যে গিয়ে সে দেখে মাটি খুঁড়ে এক জায়গা দিয়ে তোড়ে জল বার হচ্চে ফোয়ারার মত। এইসব মরু-ঝরণার নানারকম অদ্ভুত খেয়াল আছে।সিউয়া ওয়েসিসের একটা তিক্ত জলের ঝরণা এক রাত্রির মধ্যে ভূমিকম্পের ফলে মিষ্ট জলে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। হয়তো আবার এমনও হয়, দুই ফুটের মধ্যে দুটী ঝরণা রয়েচে পাশাপাশি, একটীর জল তিক্ত, অপরটীর জল মিষ্ট।

আরাজ ও সিট্রার মধ্যে সাহারা মরুভূমিতে আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। মোটেই প্রীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা নয় এই পথ হারানোটা। উটের যাতায়াতের পথের বিভিন্নমুখী গতির দরুন পথপ্রদর্শক ভুল করে উত্তরদিকের পথ

ধরলে। কিছুদূরে গিয়ে দেখা গেল সে পথ একটা শিলাস্তৃত উপত্যকায় এসে শেষ হয়ে গেল। তার চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড় আর ওই ধরণের উপত্যকা। পথের চিহ্ন নেই কোনো দিকে। কয়েকটী উপত্যকায় ঘুরবার পরে আমাদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হলো একট উচ্চ বালিয়াড়ির প্রাচীরের নীচে। সে বালিয়াড়ি টপকানো অসম্ভব, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে খাড়া সমকোণের সৃষ্টি করেচে তার দেওয়াল।

উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে বালিয়াড়িটা আমরা পার হয়ে গেলাম। উপত্যকার সর্ব্বত্র কালো নুড়ি ছড়ানো—সূর্য্যের তাপে সেগুলো আগুনের মত গরম হয়ে উঠেচে—তাপ এত বেশী যে মানুষ বা পশু উভয়েরই পক্ষে তা মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক।

পর পর কেবলই ওই এক ধরনের কালো নুড়ি ছড়ানো উপত্যকা। দূরে বিশাল জলহীন মরুভূমিটা দূর দিগন্তে মিশে গিয়েচে।সারাদিনমান আমরা মরুভূমির মধ্যে পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ালাম। একটা সুবিধা এই যে আমাদের জলের ব্যাগগুলো ভর্ত্তি ছিল, নতুবা সেই জলহীন মরুতে আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হোত।

একবার আমরা ঠিক করলাম, বরং ফিরে যাওয়া যাক্।গোধূলির সময়ও আমরা দক্ষিণ দিকেই চলেচি, পথের চিহ্নমাত্রও নেই কোনো দিকে। বালির ওপর কোথাও একটা উটের পায়ের দাগও চোখে পড়ে না।

আমাদের ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবে পথপ্রদর্শক ঘোর আপত্তি জানালে। সে বল্লে—মরুভূমিতে কখনো ফিরতে নেই।

আমরা আর একটা পাহাড়ে উঠলাম।পাহাড়ের নীচে গরম বালিতে অবশেষে উটের ক্ষীণ পদচিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম সারাদিন রৌদ্রে ঘুরে যে সে পদচিহ্ন অনুসরণ করবার উৎসাহ আমাদের ছিল না। আমরা যে যেখানে পারি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সেই পদচিহ্ন ধরে আমরা সিট্রা ওয়েসিস পৌঁছে গেলাম। এখানে ভারী সুন্দর একটা হ্রদ আছে, মরু-পথিকদের নিকট এটী অত্যন্ত পরিচিত। আর একটা হ্রদ আছে নিকটের আর একটা ওয়েসিসে—কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাতে জল থাকে না। সিট্রা হ্রদের জল কখনো কেউ শুকিয়ে যেতে দেখেনি।

এই হ্রদ দৈর্ঘ্যে পৌনে দু'মাইল, প্রস্থে পৌনে এক মাইল, সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে সত্তর ফুট নীচে এর অবস্থানভূমির উচ্চতা। হ্রদের বেড় ডিম্বাকৃতি, এবং এর জল এমন নীল যে ও-ধরণের নীল বেশী দেখা যায় না। চারিধারই মরুবালুদ্বারা বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণদিকে খানিকটা লবণাক্ত জল।হ্রদের ধারে ঘন সবুজ খর্জ্জুরবন, জলের কোলে কোলে নলখাগড়ার বন : হ্রদের অপর পারে মাউন্ট সিট্রা তার মোচার আকারের মাথাটা আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র দৃশ্যটা প্রখর সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে এক অপূর্ব্ব ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেচে। হ্রদের জল যদিও লোনা, মাঝে মাঝে মিষ্ট জলের উনুই এসে এতে যোগ দিয়েচে। মাঝে মাঝে এরা এত জোরে মাটিফুঁড়ে উঠেচে যে হ্রদের নিস্তরঙ্গ বক্ষে এক একটা বিচিত্র ফোয়ারার সৃষ্টি করেচে। হ্রদের জল বেড়ে মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে যাচ্চে তীরভূমি ছাপিয়ে। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত মরু চক্ষের নিমিষে সে জল নিচ্চে শুষে, তার ফলে হ্রদের তীরে অতি বিপজ্জনক জলাভূমি ও তার চেয়েওবিপজ্জনক প্রাণান্তকর চোরাবালির সৃষ্টি হচ্চে।এটা বিশেষ করে হচ্চে দক্ষিণ ও পূর্ব্বকূলে, সেদিকের শুকনো নুনের চড়া দেখলে মেরুপ্রদেশের ভাসমান বরফের চাপ বলে ভ্রম হয়।

মনুষ্য চলাচলের রাস্তা থেকে বহুদূরে দুর্গম সাহারা মরুর মধ্যে অবস্থিত বলে এই নীলজল হ্রদের বিচিত্র সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা খুব কম লোকেই জানে। সভ্য মানুষ এখানে কেউ আসে না—গত শতাব্দীর শেষে একজন ভ্রমণকারী এসেছিলেন, তারপর আর কেউ আসেনি।যারা সাধারণতঃ যাতায়াত করে তারা দক্ষিণ কূলের ওপর দিয়ে সে পথ সিউয়া ওয়েসিসে গিয়েচে।ঐ পথে যায়—ঘুরে এসে হ্রদের শোভা বড় একটা কেউ দেখে না।

২৫শে আগষ্ট সিট্রা পরিত্যাগ করে আমরা বাহারিয়া ওয়েসিসের দিকে রওনা হই। যাবার পথে একটা ছোট গ্রামে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। স্থানীয় সর্দ্দার আমাদের তাঁবুতে এসে আমাকে একটা পুরোনো আমলের মন্ত্রপূত কবচ ও খানিকটা জড়ানো সোনা উপহার দিলেন।

বাহারিয়া ওয়েসিসে আমরা অল্পদিন ছিলাম। তারপর আমরা আমাদের ভ্রমণপথের শেষ অংশ—বাহারিয়া থেকে ঘিজে পিরামিড একদিনে অতিক্রম করে পুনরায় সভ্য জগতে পৌঁছে গেলাম।

(বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, পৃ. ৬৪৫-৪৯)

[এই খণ্ডে বিভূতিভূষণ রচিত দুষ্প্রাপ্য 'বিচিত্র জগৎ'বইটি মুদ্রিত হল। এই ধরনের আরও কিছু রচনা নিয়ে পরবর্তীকালে 'বিপুলা এ পৃথিবী' নামে একটি বই ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সেটি পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। উভয় গ্রন্থে অগ্রন্থিত এই সিরিজের আরও একটি লেখা 'সেন্নুসিদের দেশে' এখানে মুদ্রিত হল। এমন আরও লেখা পত্রস্থ হবে পরবর্তী খণ্ডে। 'বিচিত্র জগৎ' জাতীয় রচনাবলীর সঙ্গে প্রচুর ছবি মুদ্রিত ছিল। সেগুলি এখানে ছাপানো গেল না। এজন্যে মূলগ্রন্থ বা পত্রিকার পৃষ্ঠা দেখতে হবে। আমরা দুঃখিত।]

—নির্বাহী সম্পাদক